ফিচার

একজন সৎ মানুষের প্রতিকৃতি

জসিম মল্লিক

১.

প্রায় একযুগ বাংলাদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী, জাতীয় সংসদের সদস্য, প্রখ্যাত শিল্পপতি, সমাজ সেবক, দানবীর হারুনার রশিদ খান মুন্নুর সাথে আমার কাজ করার বিরল সৌভাগ্য হয়েছিল। বর্তমানে আমি সপরিবারে কানাডা প্রবাসী হলেও তার সাথে আমার যোগাযোগটি অটুট আছে আজও। এটা একটা অনেক বড় ঘটনা। যে কারো জীবনের জন্য বড় পাওয়া।

তার মতো একজন মহান মানুষের স্নেহ-ভালোবাসা পাওয়া যে কারো জন্য বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। তার কাছ থেকে শিখেছি অনেক। কিভাবে জীবনে সংগ্রাম করে এবং সৎভাবে বাঁচতে হয় তার কাছ থেকে জেনেছি। জীবনে আদর্শ আর মূল্যবোধের এক অপূর্ব সমন্বয় দেখতে পেয়েছি তার মধ্যে। আজকে যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়েছেন এটা সম্ভব হয়েছে তার আদর্শ ও ন্যায় পরায়নতার জন্য।

আজকে তার জীবনী রচনার ক্ষেত্রে একজন অংশীদার হতে পেরে এবং আমার অনুভূতি প্রকাশ করতে পেরে আমি গর্বিত এবং আনন্দিত।

১৯৯০ সালে মুন্নু সিরামিকে জনসংযোগের চাকুরীতে ঢোকার পূর্বে আমি তার সম্পর্কে খুব অল্পই জানতাম। তখন আমি তৎকালীন সাপ্তাহিক বিচিত্রায় খন্ডকালীন কাজ করি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাশ করেছি। আমার একটা ফুলটাইম চাকুরী দরকার। বিচিত্রার শাহরিয়ার কবির একদিন মুন্নু সাহেবের সাথে আমার একটা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন। কারণ তিনি তখন একজন জনসংযোগ কর্মকর্তা খুঁজছিলেন।

সেটা ছিল জুন মাস। ১৯৯০ সাল। একদিন আমাকে দেখা করার জন্য ডাকলেন হারুণার রশিদ খান মুন্নু। বিকেল পাঁচটায়। আমি তাকে আগে চাক্ষুষ দেখিনি। বয়স কেমন তাও জানিনা। দৈনিক বাংলা ভবন থেকে রিকশা নিয়ে রওয়ানা হলাম ৯ ওয়্যার স্ট্রীট, ওয়ারীতে। মুন্নু শিল্পগোষ্ঠির কর্পোরেট অফিস। পাঁচটা বাজার পাঁচ মিনিট পূর্বেই পৌঁছাতে পেরেছিলাম। সেদিন সঠিক সময়ে পৌঁছাতে পেরে যে কতটা ভালো করেছিলাম তা আজ উত্তর আমেরিকার মতো দেশে এসে উপলব্ধি করি। তিনি যে কতখানি সময়ানুবর্তী মানুষ সে সম্পর্কে উল্লেখ করবো। যাইহোক দুরু দুরু বক্ষে বসে আছি তার সেক্রেটারী আবদুল হাইয়ের রুমে। কখন ডাক পড়বে। ঠিক পাঁচটায়ই আমার ডাক পড়লো। আমি গেলাম তার কক্ষে। কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। আমার সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সবশেষে আমার রেজুমি রেখে যেতে বললেন তার সেক্রেটারীর কাছে এবং আমাকে কফি দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। সাক্ষাৎ পর্বটি ছিল খুবই আন্তরিক। আমার ভালো লেগেছিল মানুষটিকে।

যদ্দুর মনে পড়ে এর দু'এক দিন পরই আমাকে একটা স্কুলের পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে নিয়ে গেলেন। স্কুলটা হচ্ছে নওয়াবগঞ্জের শিকারীপাড়া হাই স্কুল। সেটা ছিল আমার ট্রাইল জব। তিনিই বলেছিলেন। সেদিনের সেই অনুষ্ঠানে তার প্রথম বক্তব্য শুনে আমি বিমুগ্ধ হয়ে

গিয়েছিলাম। কাজটা ছিল অনুষ্ঠানের নিউজ পত্রিকায় কভার করা। আমি টেপরেকর্ডার নিয়ে গিয়েছিলাম এবং ধার করা একটা ক্যামেরা। আমি তার বক্তৃতা শুনে এতটাই বিমুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম যে বক্তৃতা রেকর্ড করতে ভুল হয়ে যাচ্ছিল। আমি এই কাজটা পারি কিনা এটার উপরই নির্ভর করছিল আমার চাকুরী হওয়া না হওয়া। কারণ এর আগে যিনি তার সাথে কাজ করছিলেন সেই আবুল কালাম পান্না ছিলেন একজন সিনিয়র সাংবাদিক। তার আকস্মিক মৃত্যুতে আর একজন লোকের প্রয়োজন হয়। আমার বয়স তখন মাত্র ২৮/২৯ হবে। তাই প্রথম সাক্ষাতে আমাকে দেখে মুন্নু সাহেব বললেন 'আপনার বয়স তো খুব কম; আমি একজন বয়স্ক লোক খুঁজছিলাম'। আমি বলেছিলাম, স্যার আমার বয়স কম হলেও কাজটা আমি পারবো। আসলে তখন আমি মরিয়া একটা চাকুরীর জন্য। কোনভাবে যদি চাকুরিটা পাই তাহলে আমি সফল হবো এই বিশ্বাস আমার ছিল।

সেদিন বিকেলে স্কুলের ফাংশন থেকে ফিরে আমি সর্ব্বোচ চেষ্টা দিয়ে নিউজ লিখে ছবি সহ পাত্রিকা অফিসগুলোতে পাঠালাম প্রেস রিলিজ। খরচ বাবদ তিনি আমাকে তিন হাজার টাকা দিয়েছিলেন সেদিন। যদিও আমার খরচ হয়েছিল খুব সামান্যই। পরবর্তীকালে দেখেছি তিনি যে কোন কাজে পাঠালে প্রয়োজনের দ্বিগুন টাকা দিতেন। এর কারণ তিনিই একবার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে কখন কি প্রয়োজন হয় কেউ বলতে পারেনা। এজন্য সবসময় তৈরী থাকা ভালো। যাইহোক আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম যে পরদিন সবগুলো পত্রিকায় নিউজটা ছাপা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিখ্যাত সাংবাদিক রেজোয়ান সিদ্দিকী আমাকে সাহায্য করেছিলেন। মুন্নু সাহেবের ব্যাক্তিগত সুনামের কারণেও সেদিন এতগুলো পত্রিকায় নিউজটা ছাপা হয়ে থাকবে। মিডিয়ার সাথে তার সম্পর্কের কথা পরে আলোচনা করবো।

তিনি পরদিন সবগুলো প্রত্রিকা সাথে নিয়ে চলে গেলেন আমেরিকা। আমি একটু অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেলাম। চাকুরীটা হবে কি হবে না এই দোদুল্যমানতার ভিতর দিয়ে দু'আড়াই মাস কেটে যায়। অফিসের অন্য কারো এ ব্যাপারে তেমন কিছু করার ছিলনা। তার ডিসিশনই চূড়ান্ত। তিনি সবার মতামত শোনেন ঠিকই তারপর নিজের মতো সিদ্ধান্ত নেন। এবং তার সিদ্ধান্তের উপর সবাই আস্থাশীল। আমি তাকে ভুল সিদ্ধান্ত নিতে বেশী দেখিনি।

এরপর একদিন আকস্মিক আমার ডাক পড়লো। মুন্নু সাহেব একজন চমৎকার ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যে কোনো কথা এবং কাজে যে গুরুত্ব রয়েছে সেটাই তাকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। কারণ তিনি যখন যেটা বলেন সেটা গুরুত্বের সাথেই বলেন। শুধুমাত্র বলার জন্য তাকে কখনো বলতে দেখিনি। একটা সিরিয়াসনেস সবসময়ই থাকে তার কথা এবং কাজে। আমি দেখেছি তিনি যেখানেই থাকুন না কেনো তার পুরো অফিস থাকে সদা সতর্ক , এমন না যে তিনি কাউকে অহেতুক কিছু বলেন। শুধু তার ব্যক্তিত্বের কারণে তাকে সবাই শ্রদ্ধা করে।

২.

যাইহোক সেটা ছিল এক বুধবার। আমার জয়েনিং ডেট। বুধবার হচ্ছে মুন্নু সাহেবের প্রিয় ডেট। তিনিই আমাকে অফিসে ডাকলেন একদিন এবং জিজ্ঞেস করলেন আমি কবে জয়েন

করতে চাই। আমি বললাম, স্যার আপনি যেদিন বলেন। তিনি বললেন 'বুধবার হচ্ছে আমার প্রিয় ডেট'। আমি বুধবারই জয়েন করেছিলাম। মুন্নু সিরামিকের জনসংযোগ অফিসার হিসাবে আমি আমার চাকুরী জীবন শুরু করলাম।

তখন এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে গোটা দেশ উন্মাতাল। চারিদিকে অস্থিরতা। কি হবে না হবে এই নিয়ে সবার মধ্যে শংকা। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এরশাদের পতন হলে তত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসে। ১৫ দলীয় ও ৭ দলীয় জোটের তখন নির্বাচনের তোড়জোর। এক সুন্দর সন্ধ্যায় গুলশানে বি এন পি' র স্থায়ী কমিটির সদস্য প্রয়াত কর্ণেল (অব) মুস্তাফিজুর রহমানের বাসভবনে মুন্নু সাহেবের ডাক পড়লো। সেখানেই বি এন পি' র চেয়ারপারসন ও সাত দলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অনুরোধে জনাব মুন্নু বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে যোগদান করলেন। বেগম খালেদা জিয়া তখন সৎ মানুষের সন্ধান করছিলেন। যাদের মাধ্যমে শহীদ জিয়ার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবেন এই ছিল স্বপ্ন। তিনি এই আহবানে সাড়া দিয়েই সেদিন বি এন পি'তে যোগদানে রাজী হয়েছিলেন। তাকে মন্ত্রী করারও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল সেই যোগদান অনুষ্ঠানে। সেই স্মরণীয় মুহুর্তে আমার সেখানে থাকার সুযোগ হয়েছিল। আরো ছিলেন সাংবাদিক সৈয়দ মেজবাহ উদ্দিন।

এরপর শুরু হলো নির্বাচনের তোড়জোর। নমিনেশন কে পাবে না পাবে এই নিয়ে আলোচনা। কোন দল ক্ষমতায় আসবে সে আলোচনাও তুঙ্গে। অনেকেরই একটা ধারণা হলো নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসবে। আওয়ামী লীগ একটা ছায়া কেবিনেটের মতোও তৈরী করে ফেললো।

মুন্নু সাহেবের জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ কোন আকস্মিক ঘটনা ছিলনা। এর পূর্বেও তাকে বহুবার রাজনীতিতে টানার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু তিনি আদর্শগত কারণেই সময় নিচ্ছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠারও একটা ব্যাপার ছিল। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতির মাধ্যমে নিজের পশ্চাৎপদ এলাকা তথা দেশের জন্য কাজ করা। এ জন্য তিনি ব্যাবসায় যেদিন থেকে সাফল্য পেতে শুরু করেন সেদিন থেকেই জনহিতকর কাজে নেমে পড়েন। গোটা মানিকগঞ্জ হয়ে পড়ে তার বিচরণ ক্ষেত্র। একটা গ্রাউন্ডওয়ার্ক আগে থেকে তৈরী হয়েই ছিল। তাই তার রাজনীতিতে প্রবেশ বা নির্বাচন করা একটা সময়ের ব্যাপার ছিল মাত্র।

মানিকগঞ্জ-২ (শিবালয়-হরিরামপুর) আসন থেকে জনাব মুন্নু নমিনেশন পেলেন। মানিকগঞ্জে সাতটি থানা নিয়ে চারটি নির্বাচনী এলাকা। অন্যান্য আসন থেকে যেমন মানিকগঞ্জ-১ (ঘিওর- দৌলতপুর) থেকে পেলেন খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, মানিকগঞ্জ-৩ (মানিকগঞ্জ সদর) থেকে নিজামউদ্দিন খান এবং মানিকগঞ্জ-৪ (সিংগাইর এবং মানিকগঞ্জ সদরের কিছু অংশ) থেকে শামসুল ইসলাম খান নমিনেশন পেলেন।

২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১। দেশে প্রথমবারের মতো তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। বি এন পি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহায়তা নিয়ে নর্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করলো এবং সরকার গঠনে সক্ষম হলো। বি এন পি'র সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন অপ্রত্যাশিত ছিল। আওয়ামী লীগ এতটাই হতবাক হলো নির্বাচনী

ফলাফলে যে তারা এই নির্বাচনকে সূক্ষ্ম কারচুপির নির্বাচন বলে আখ্যায়িত করলো। মানিকগঞ্জে বি এন পি চারটি আসনেই জয়লাভ করলো এবং মুন্নু সাহেব বিপুল ভোটে তার তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি আওয়ামী লীগের মহিউদ্দিন আহমেদকে পরাজিত করলেন।

মুন্নু সাহেব খুবই দুরদর্শী মানুষ। তিনি অনেক দূরের জিনিস দেখতে পান। আশ্চর্য্যজনক হচ্ছে তিনি নির্বাচনের পূর্বে বলেছিলেন যে বি এন পি ক্ষমতায় আসতে পারে এবং সেটাই সত্যে পরিণত হয়েছে। বি এন পি সরকার গঠন করলো কিন্তু বেগম জিয়া তার ওয়াদা থেকে সড়ে গেলেন। তিনি মুন্নু সাহেব কে মন্ত্রী করলেন না। মুন্নু সাহেব এই ঘটনায় হতবুদ্ধ হলেও দমে গেলেন না। তিনি তার প্রতিশ্রুতি থেকে সড়ে যাওয়ার লোক নন। তার প্রতিশ্রুতি হচ্ছে জনগনের সাথে। তারা তাকে ভোট দিয়েছে। আগামী পাঁচ বছর প্রতিশ্রুতি পূরনই হবে তার কাজ। তিনি পাঁচশালা পরিকল্পনা নিয়ে কাজে ঝাঁপ দিলেন।

নির্বাচনই আমাকে মুন্নু সাহেবের কাছাকাছি নিয়ে আসতে সহায়তা করে। এর পরে ১৯৯৬ এর দুটো এবং ২০০১ এর দুটো আসনের নির্বচন করার সুযোগ আমার হয়েছে। নির্বাচনী প্রচারণা, পোষ্টার, লিফলেট, ব্যানার, পত্রিকা কভারেজ ইত্যাদি কাজের সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করলাম আমি। আমার অজান্তে জড়িয়ে পরলাম এক ভিন্নধর্মী কাজে। জনগন নিয়ে কাজ। দুরুহ কিন্তু চ্যালেঞ্জিং। মানুষকে খুশী করা যে পৃথিবীর কঠিন কাজের একটি সেটা আমি বুঝতে পারলাম। ১৯৯১ সালের নির্বাচন আমরা পরিচালনা করেছিলাম মুন্নু সাহেবের ধানমন্ডির ২৭ নম্বর রোডের ৯ নম্বরস্থ বাসভবন থেকে।

৩.

আজকে আমি কানাডা প্রবাসী। পৃথিবীর একটি উন্নত দেশের নাগরিক। আমার জীবনের পুরো ধারনাটাই তিনি বদলে দিয়েছিলেন। কানাডা প্রবাসী হওয়ার পূর্বেও আমি ইউরোপ আমেরিকা দেখার সুযোগ পেয়েছি।

১৯৯১ সালে প্রায় দুই মাসের নির্বাচনী প্রচারনার সময়ই তার সাথে থেকে দেখেছি একজন মানুষ কতখানি ধৈর্য্য আর মহৎ গুনাবলী দিয়ে মানুষের মনের মনি কোঠায় প্রবেশ করতে পারেন। তিনি কখনো কারো কাছে সরাসরি ভোট চাইতেন না। গত চারটি নির্বাচনেই কখনোই তাকে ভোট চাইতে দেখিনি। তিনি জনসভায় তার কর্মসূচী বলেছেন এবং মানুষ তাকে ভোট দিয়েছে। মানুষ তার মুখের কথাকে মনে প্রানে বিশ্বাস করে।

শিবালয়-হরিরামপুর এলাকাটা দারিদ্র্য পিড়িত এবং পদ্মার ভাঙ্গনে জর্জরিত। বেশীরভাগ এলাকাই পদ্মার করাল গ্রাসে চলে গেছে। তার নিজের বাড়িঘরও কয়েকবার পদ্মার পেটে চলে গেছে। নির্বাচন করতে এসে তিনি মানুষ চিনতে শুরু করেন। রাজনৈতিক টাউটদের শক্ত হাতে ট্যাকল করে প্রথম নির্বাচনেই তিনি তার দক্ষতা প্রমাণ করেন। প্রথম প্রথম যারা তার বিরোধিতা করেছে তাদেরই একসময় তার পায়ের কাছে বসে থাকতে দেখেছি। তিনি কখনো প্রতিশোধ পরায়ন ছিলেন না। তার চলার পথে অনেকেই কাঁটা বিছিয়েছে কিন্তু তিনি তাদের বুকে তুলে নিয়েছেন। পূর্বে নির্বাচন না করলেও তিনি প্রভাবশালী মানুষ কিন্তু কখনো

ক্ষমতার প্রকাশ ঘটান নি। এটাই তাকে অন্য আর সবার থেকে স্বাতন্ত্র দিয়েছে। ভিন্ন এক মানুষে পরিণত করেছে।

নদী ভাঙ্গনে জর্জরিত মানুষেরা সবসময়ই তার কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে। তাদের পুর্নবাসনের জন্য অনেক প্রকল্প তিনি গ্রহণ করেছেন। স্কুল, মসজিদ, চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি, হাট বাজার সহ অনেক ধরণের কর্মসূচী রয়েছে এরমধ্যে। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক যেটা সেটা হচ্ছে তার মানুষের কাছে যাওয়ার তীব্র আকংখা। আমি আমার একযুগ সময়কালে খুব কম দেখেছি কাউকে ফিরিয়ে দিতে। আমরা যারা তার সফরসঙ্গী হতাম তারা মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম কিন্তু তিনি ছিলেন দুর্বার। ক্লান্তি কাকে বলে সেটা তার মধ্যে কখনো দেখিনি। বছরে অন্তত: তিনি দুইশত বার এলাকায় গেছেন এবং প্রতিটি সফরে গড়ে তিন চারটি করে জনসভা করেছেন। তাহলে সহজেই অনুমেয় কত হাজার জনসভা তিনি করেছেন। প্রতিটা জনসভার বক্তৃতা রেকর্ড করা হতো এবং ক্যামেরা বন্দী করা হতো।

প্রতিটা জনসভায় যে সমস্ত সাহায্য প্রার্থীরা আসতো তিনি তাদের কখনো শূন্য হাতে ফেরান নি। কোন ওয়াদা সাথে সাথে পূরন করা সম্ভব না হলে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলতেন 'আমি যদি আজ রাতে মারা যাই তাহলে আমার ওয়াদা যেনো পূরন করা হয়'। ওয়াদা বরখেলাপের কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। তার প্রতিশ্রুত যেকোনো কিছু তিনি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আদায় করতেন। তিনি যে কোটি কোটি টাকা সাহায্য দিতেন তা তার নিজস্ব তহবিল থেকে। সরকারী সাহায্য যা আসতো তার পুরোটাই বিলিয়ে দিতেন। সরকারী সাহায্যের চেয়ে তার নিজস্ব সাহায্যের পরিমাণ কয়েকগুন বেশী হতো সবসময়। তিনি একটা কথা সবসময় বলেন সেটা হচ্ছে, 'আল্লাহই মানুষকে আমার কাছে পাঠান। আমি যদি তাদের ফিরিয়ে দেই তাহলে পরকালে আল্লাহর কাছে কী জবাব দেবো'? মানুষের কাছে তার কোন ঋণ নেই। কেউ যদি তাকে কখনো দাওয়াত করে খাওয়াতেন তিনি খুশীই হতেন এবং আসার সময় পরিবারের লোকজন বা বাচ্চাদের হাতে খরচের কয়েকগুন দিয়ে আসতেন চড়ুইভাতি করার নাম করে। এরকম সূক্ষ্ম অনুভূতির মানুষ তিনি।

সরকারী অফিসে তার আগমনের জন্য যত খরচ হতো তা তিনি নিজেই দিয়ে দিতেন। এমনকি জাতীয় দিবসগুলো পালনের জন্য সরকারী তহবিলের অপ্রতুলতা পূরন করতেন তিনি। আসলে তার দানের ক্ষেত্র এতটাই বড় যে লিখে শেষ করা কঠিন। তিনি বিভিন্ন উপায়ে মানুষকে সাহায্য করতেন যা অনেকের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। গরিবের চিকিৎসা থেকে শুরু করে মেয়ের বিয়ে দেয়া হাজারো দাবী তার কাছে আসতো। তিনি কাউকেই ফেরাতে পারতেন না। অনেক অসুস্থ মানুষকে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা চালিয়ে গেছেন। অনেক দুস্থ পরিবারকে সাহায্য চালিয়ে গেছেন।

৪.

ক্ষমতার দম্ভ নেই তার মধ্যে। অতিশয় বিনয়ী একজন মানুষ। তার অফিসের অধিনস্থদের তিনি কখনো কর্মচারী বলেন না; বলেন সহকর্মী। একজন সাধারণ শ্রমিকেরও তার কাছে

যাওয়ার বা কথা বলার সুযোগ আছে। ফ্যাক্টরী ভিসিট বা অফিস ভিসিটের সময় দেখেছি লোকজন কতো খুশী হতো। তিনি যখন অনেকদিন পর বিদেশ থেকে এসে অফিস বা ফ্যাক্টরী ভিসিটে যেতেন সবাই আনন্দিত হতো। তিনি প্রতি বছর কয়েকহাজার কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়ে বাৎসরিক একটা ভোজসভা করতেন। এটা সবার জন্য ঈদের আনন্দের উৎসবের মতো ছিল। সবাই সেজে গুজে আসতো সেদিন। আনন্দের বন্যা বয়ে যেতো ধামরাইয়েরে মুন্নু সিরামিকের ফ্যাক্টরী এলাকার মনোরম পরিবেশে মধ্যে। বিশাল সামিয়ানা খাটিয়ে ঢাকার শ্রেষ্ঠ বাবুর্চি মুখরোচক সব খাদ্য তৈরী করতো।

তার মধ্যে একটা ব্যাপার দেখে আমি অবিভূত হতাম সেটা হচ্ছে তিনি একজন সাধারণ শ্রমিক অসুস্থ হলেও দেখতে যেতেন। এই কাজটি তিনি প্রায়ই করতেন নিভৃতে। তার পরিচিত হোক বা আত্মীয় হোক কারো অসুস্থতার কথা শুনলে ছুটে যেতেন। একবার আমি নিজেও অসুস্থ হয়েছিলাম। মাত্র তখন চাকুরিতে ঢুকেছি। কয়েকদিন পরই আমার একটা অপারেশন হয়েছিল। একদিন দিখি তিনি পিজি হাসপাতালে গিয়ে হাজির। আমি এতটাই অবিভূত হয়েছিলাম সেদিন যে আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। আমি অনুভব করেছি কেনো সহজে কেউ তাকে ছেড়ে অন্যত্র যেতে পাতো না। তার ভালোবাসার জোর এতটাই্ তীব্র ছিল যে যাকে উপেক্ষা করা খুব সহজ কাজ নয়।

প্রতি ঈদের সময় কম্পানীর নির্দিষ্ট বোনাসের পরও আমরা 'বড় সাহেবের' স্পেশাল বোনাসের জন্য অপেক্ষা করতাম। তিনি অনুভব করতেন কোম্পানী নিয়মের মধ্যে যে বোনাস দেয় তা দিয়ে হয়ত সুন্দর মতো ঈদ করা সম্ভব হয়না তাই তিনি নিজে একটা বোনাসের ব্যাবস্থা করতেন। সবাই সুন্দর মতো ঈদ করতে পারতো। তিনি প্রায়ই একটা কথা বলতেন, 'আমার ইচ্ছে করে সবাইকে খুশী করি কিন্তু আমি তো নিয়মের বাইরে যেতে পারবো না'। তার প্রশাসন একটি আদর্শ উদাহরণ প্রাইভেট সেক্টরে। একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীকে কিভাবে দক্ষভাবে পরিচালনা করে উচ্চতর শিখরে নিয়ে যাওয়া যায় তা এই উত্তর আমেরিকার মতো দেশে সে বুঝতে পারছি। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় তার প্রশাসন অনেক ক্ষেত্রেই কানাডার প্রশাসনের চেয়েও ভালো। তিনি চমৎকার একটা টীমওয়ার্ক তৈরী করেছেন। একটা সিস্টেম দাঁড় করিয়েছেন যেটা তার অনুপস্থিতেও কাজ করে যায়।

তিনি যখন এলাকায় সফরে যান একটা উৎসবের আবহ তৈরী হয়। নারী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে সেজে গুজে তৈরী হয়ে থাকতো। শিশুরা "মুন্নু" দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতো। মহিলারা তাকে খুব ভালোবাসতেন। এর একটা ব্যাখ্যাও তিনি দিতেন সেটা হচ্ছে তিনি সবসময় শিশুদের কথা বলতেন, তাদের কল্যাণের কথা বলতেন তাই হয়তো মহিলারা খুশী হন যে তাদের সন্তানের কথা তিনি ভাবেন। নারী ও শিশুদের প্রতি তার প্রগাঢ় মমতা ছিল। নারীদের তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। যেকোন ভদ্র মহিলারা তার সাক্ষাৎপ্রার্থী হলে তিনি তার রুমের দরজা খুলে কথা বলতেন। যে দেশে পুরুষেরা নারীদের অবজ্ঞার চোখে দেখে সেখানে তার এই সম্মান প্রদর্শন বিরল ঘটনা বৈকি!

নিজের স্ত্রীর প্রতিও তার ছিল অগাধ আস্থা এবং ভালোবাসা। তিনি সবসময় তার বক্তৃতা বা আলোচনায় স্ত্রীর কথা বলতেন। আজকে এই পর্যায়ে আসার পিছনে তার স্ত্রীর যে প্রধান ভূমিকা সেকথা তিনি সবসময় কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। আমিও দেখেছি মানুষের প্রতি তার স্ত্রীর যে দরদ তার কোন তুলনা হয়না। অত্যন্ত নিরহংকারী একজন মানুষ হুরন্নাহার রশিদ খান। আমাদের সাথে কথা বলতেন অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে। সুযোগ হলে আমার স্ত্রী সন্তাদের সাথেও তিনি কথা বলতেন। ওদের কথা জানতে চাইতেন। বাসায় গেলে চমৎকার আতিথেয়তা করতেন। এগুলো খুবই বিরল ঘটনা। এইসব ভালো গুনাবলীই তাদেরকে সাতন্ত্র দিয়েছে। আলাদা করেছে অন্যদের থেকে।
এলাকার রিক্শাওয়ালারা, নৌকার মাঝিরা, দলীয় কর্মীরা, স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসা, ক্লাবের কর্মকর্তারা তার আগমনের অপেক্ষায় থাকতো সবসময়। দলীয় কর্মীরা থাকতো অপেক্ষায়। এমনকি সরকারী কর্মকর্তারা, পুলিশ প্রশাসনও আনন্দিত হতো। পুলিশ প্রশাসন তার নিরাপত্তার জন্য আসতো স্বত:প্রনোদিত হয়েই। তিনি তাদের সবসময় সাহার্য করতেন। কোনদিন এর ব্যতিক্রম হতে দেখিনি। এমনকি মন্ত্রী হওয়ার পরও তার প্রটেকশন পার্টিকে সবসময় বখশিস দিয়েছেন। এজন্যে তার ডিউটিতে আসার জন্য তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেতো। এমন কি ঈদের সময় এলাকার গরীব লোক, দলীয় কর্মী, সরকারী কর্মকর্তা, পুলিশ সবাই ঈদ বোনাস পেতো। নিজ দলীয় কোন মন্ত্রী এলে বা বিশেষ কোন ব্যক্তি এলাকায় এলে তাদের আপ্যায়নের সমস্ত খরচ তিনি বহন করতেন। নিজ দলীয় প্রধানমন্ত্রী যতবার তার এলাকা সফর করেছেন সব খরচ তিনি দিতেন। তিনি সরকারী পয়সা খরচ করতে দিতেন না। আমি নিজেও বেশ কয়েকবার দেশী বিদেশী সাংবাদিক নিয়ে গিয়েছি তার এলাকায়। তিনিই সব আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতেন। তার এলাকার মঙ্গলের জন্য তিনি যে যেকোন কিছু করতে তৈরী ছিলেন। সম্ভবত এ ধরণের ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে বিরল।
তিনি যখনই এলাকায় যেতেন রিক্শার লাইন পড়ে যেতো। রিকশায় চড়েন বা না চড়েন সবাই একশত করে টাকা পেতেন। নৌকায় চড়ে কোথাও গেলেও মাঝিদের কয়েকদিনের রোজগার হয়ে যেতো। তিনি চড়তেন একটা নৌকায় উপস্থিত হতো দশটি নৌকা। কেউই খালী হাতে ফিরতো না। দলীয় কর্মীরা কষ্ট করে এসেছে বলে তাদের খালী হাতে ফেরাতেন না কখনো। বেশ কিছু লোকজন ছিল যাদের সংসারই চলতো তার সাহায্যের উপর। অনেক কে তিনি প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। কাউকে দোকান করে দিয়েছেন। কাউকে ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য তহবিল যুগিয়েছেন। নিজের প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর ব্যাপারে এলাকার লোকের প্রধান্য ছিল সবসময়। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও দেয়া হতো সাহায্য। তার এলাকায় এমন কোন প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে তার সাহায্যের ছোঁয়া নেই।
শুধু তার এলাকাই নয় মানিকেগঞ্জের সব এলাকা এবং অন্যান্য অনেক এলাকার সংসদ সদস্যরা তাকে নিয়ে যেতেন। তাতে তাদের নির্বচনে সুবিধা হতো। তিনি সাহায্য করেন অকাতরে। মানুষের চিন্তার বাইরে তার দানের হস্ত। এমনও হয়েছে তার হাতে সাহায্যের

বিশাল লিষ্ট। আমরা বাজী ধরতাম কোন প্রতিষ্ঠানকে কত টাকা সাহায্যের ঘোষণা দেবেন এটা বলে। আমাদের ধারনাকে প্রায়ই অসার প্রমান করে তিনি চমকে দিতেন। কাউকেই বঞ্চিত করতেন না।

৫.

১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনের পর পরবর্তী নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি তার প্রতিশ্রুত কাজ নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। মানিকগঞ্জের মানুষ যাতে সহজে তার সাথে দেখা করতে পারে সেজন্যে শ্যামলীতে একটি রাজনৈতিক কার্যালয় খোলা হয়েছিল। এই কার্যালয়টি আমিই খুঁজে বের করেছিলাম। এটি শ্যামলী সিনেমা হলের ঠিক পিছনেই অবস্থিত ছিল। ২৪/১-১ রিং রোডে ছিল এর ঠিকানা। দোতলায়। যাতে গাবতলী থেকে নেমেই এখানে আসা যায়। এই কার্যালয়টি ২০০১ সালের নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত বহাল ছিল।

রাজনৈতিক কারণে পারিবারিক জীবনে যাতে কোন ব্যঘাত না সে ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। ২০০১ এর নির্বচনের পূর্বে তার পরিবারের কেউ এমনকি তার অফিসের কোন লোকও তার রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলো না। ২০০১ সালে যখন তিনি দুটো আসন থেকে নির্বাচন করেন তখনই কেবল তার জ্যেষ্ঠ কন্যা আফরোজা খান নির্বাচনী প্রচারনার কাজে সহায়তায় এগিয়ে আসেন এবং তিনি অভাবনীয়ভাবে সফল হন। মানুষ তাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে। আমি দেখেছি মানুষ তার জনসভায় ছুটে আসতো। তার মিষ্টভাষী বক্তব্য শুনতে মানুষ খুব পছন্দ করতো। এখন তিনি পুরোদস্তুর রাজনীতিবিদ। মুন্নু সাহেবের যোগ্য উত্তরসুরী।

শ্যামলীর কার্যালয়টির সময়সূচী ছিল বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত। আমি তখন ওয়ারী অফিস শেষ করে চারটার মধ্যে শ্যামলী এসে পোঁছাতাম। মাসে এই অফিসটির পিছনে প্রায় লাখ টাকা খরচ হয়ে যেতো। মানুষ খুব খুশী হলো স্বচ্ছন্দে তারা তাদের এমপির সাথে দেখা করতে পারছে বলে। অফিসটির জন্য তিন চারজন কর্মচারী নিয়োগ হলো। সে এক এলাহী অবস্থা। যখন সংসদ অধিবেশন চলতো তখন মুন্নু সাহেব নিজের অফিস শেষ করে যেতেন সংসদে তারপর আসতেন শ্যামলী কার্যালয়ে। অসুস্থতা ছাড়া কখনো শ্যামলীর কার্যালয়ে আসা বন্ধ হয়নি। প্রতিদিন গড়ে এই কার্যালয়ে শতাধিক ভিজিটর আসতো। তিনি সবার কথা শুনতেন। প্রয়োজনে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। এখানেই দলীয় জরুরী মিটিংগুলো হতো। একটি ক্ষড় হলরুম ছিলো যেখানে একশত লোক বসার ব্যবস্থা ছিল। তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থাও থাকতো। তিনি যদি দশ জনকে ডাকতেন মানুষ আসতো পঞ্চাশজন। কিন্তু কখনো কাউকে ফেরানো হতোনা। শ্যমলী অফিসে সবাইকেই চা নাস্তা দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো। ২০০১ এর নির্বাচনের সময় থেকে ধানমন্ডির বাসভবন তার রাজনৈতিক কার্যালয় হিসাবে ব্যাবহৃত হয়েছে। এমনকি মন্ত্রী হওয়ার পরও।

তিনি যখন বিদেশ যেতেন তখনও শ্যামলীর কার্যালয় বন্ধ থাকতো না। আমি নিয়মিত অফিস খুলতাম। মানুষের দরকারগুলো নোট করে তাকে জানাতাম। তিনি বিদেশ বসেই সব নির্দেশ দিতেন। যে কোন সমস্যার এত অনায়াস সমাধান আমি কোনদিন কাউকে দিতে

দেখিনি। তার মাথা এত দ্রুত কাজ করতো যে অবাক হয়ে যেতে হতো। যে সমস্যাকে পাহাড়ের মতো মনে হতো আমাদের কাছে সেটাকেই তিনি পানির মতো সহজ করে দিতেন। রজনীতিতে তাকে অনেক জটিল সমস্যার মুখোমুখী হতে হয়েছে অনেকবার। তার প্রতিপক্ষরা তাকে দমানোর অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোনবারই তারা সফল হয়নি। তিনি তার বুদ্ধিমত্তা আর সাহস দিয়ে সব কাটিয়ে উঠেছেন বার বার। তবে একথা নিদ্বিধায় বলবো রাজনীতিতে তার যোগ্য মর্যাদা তিনি পাননি। তার সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। জাতিকে তার আরো অনেক দেওয়ার ছিল। তার পুরো জীবনটাই একটা সংগ্রাম মুখর। কোন কিছুই তিনি সহজে অর্জন করেননি। সব কিছুর পিছনেই রয়েছে এক একটা সংগ্রামের ইতিহাস। সে ইতিহাস এতই চমকপ্রদ যে তা নিয়ে এক একটা উপন্যাস রচনা করা যায়। এত বৈচিত্র্যে ভরা মানুষের জীবন খুব কম হয়।

শ্যামলীর অফিসের একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। সেটা ১৯৯৫ সাল হবে সম্ভবত। মন্নু সাহেবের ওপেন হার্ট সার্জারী হলো লন্ডনে। মানুষের সে কি আহাজারী! প্রতিদিন খবর নেওয়ার জন্য মানুষ শ্যামলী অফিসে ভীড় জমাতো। মানুষের কান্না দেখে আমি অবিভূত হয়ে গেলাম। মসজিদে মসজিদে তার জন্য দোয়া হলো। এটা শুনে অপারেশনের পর মুন্নু সাহেব এলাকার লোকজনের সাথে কথা বলতে চাইলেন লন্ড থেকে। কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইলেন ভালোবাসার। খবর পাওয়ার পর কয়েকশত লোক এসে উপস্থিত হলো শ্যামলী অফিসে। প্রায় দুই/তিন ঘন্টা সেদিন তিনি লোকজনের সাথে কথা বলেছিলেন।

৬.

’৯১ এর নির্বাচনের প্রাক্কালে তিনি হরিরামপুর সদরে নিজস্ব বাড়ি বানালেন। এলাকায় গেলে যাতে মানুষ সহজে তাকে পায় বা আপ্যায়িত হতে পারে এ মানসে তিনি বিশাল এক বাড়ি তৈরী করলেন। মাঝে মাঝে তিনি এখানে রাত্রী যাপনও করতেন। তখন দেখতাম সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত মানুষের ভীর লেগেই থাকতো। তিনি বিরামহীন মানুষের সাথে মিশতে পারতেন। একটা উৎসব লেগে থাকতো যতক্ষন তিনি থাকতেন ততক্ষন। বিশেষ করে প্রতিটা নির্বাচনের সময় একনাগারে অনেক দিন এখানেই থাকতেন। তার স্ত্রীও এ সময় তার সঙ্গী হতেন।

তার সবকিছুতেই রয়েছে পরিকল্পনা ও রুচির ছাপ। তিনি যে বাড়িটি বানালেন সেটি ছিল সুন্দর দেখতে। টিনের দোচলা ঘর। আধুনিক সব সুযোগ সুবিধার সমন্বয় ঘটানো হয়েছিল। সেখানে গাছ গাছালি আর ফুলের বাগান করে মনোমুগ্ধকর পরিবেশ তৈরী করলেন। দুর দুরান্ত থেকে মানুষজন আসতো এই বাড়িতে দেখা করতে। অনেক মন্ত্রী মিনিষ্টারও এই বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন।

শুধু এই বাড়িটি বলে নয় জীবনে তার সব কিছুতেই দেখেছি রুচি আর আভিজাত্যের পরিচয়। সৃষ্টিশীল মানুষেরা যে রকম হন তিনি সেরকম। তার পোশাক আশাক, জুতো, জামা, টাই, ঘড়ি তার অফিস, বাড়ি, গাড়ি সব কিছুই রুচিশীল। তিনি মানুষ হিসাবেও অত্যন্ত সৌখিন। পৃথিবীর সব দেশই প্রায় ভ্রমন করেছেন, প্লেনের দামী ক্লাসে চড়েছেন,

থেকেছেন দামী দামী সব হেটেলে। পরেছেন মূল্যবান ঘাড়ি, টাই, স্যুট সবকিছু। কিন্তু তার মধ্যে দেখানেপনা ভাব কোনদিন ছিলনা। তিনি গাড়িতে এমনভাবে বসতেন যেনো মনে না হয় তিনি খুব দামী গাড়িতে বসে আছেন। খুব সচেতন ছিলেন তিনি সব ব্যাপারে। তার স্মরণশক্তি বিস্ময়কর। তিনি একসাথে প্রায় পাঁচশত ফোন নম্বর মনে রাখতে পারতেন এক সময়। শুধু তাই নয় আরও অনেক ছোট খাট জিনিস মনে করে দিয়ে আমাদের তাজ্জব করে দিতেন। আসলে আমার দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন একজন সম্পূর্ণ মানুষের প্রতিকৃতি। বিরল এক মানুষ।

প্রথম যখন তিনি নির্বাচনী প্রচারনায় নামেন তখন তাকে নিয়ে মজার মজার সব কৌতুহল ও আলোচনা দানা বাঁধছিল। এর আগে তিনি বেছে বেছে অনুষ্ঠানে যেতেন। সবাই তাকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পায়নি। যার বেশীরভাগই ছিল স্কুল। দুষ্ট লোকেরা তখন প্রচার করলো যে তিনি এমপি হলে তার বাড়িতে কেউ দেখা করতে যেতে পারবে না। গেট দিয়ে দারোয়ানরা ঢুকতেই দেবেনা। হ্যান্ডশেক করে তিনি সাবান দিয়ে হাত ধোবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। পরবর্তীকালে দেখা গেলো তার বাড়ির দরজা সবসময়ই খোলা, আর তিনি হ্যান্ড শেকই শুধু করেননা বুকেও তুলে নেন মানুষকে। তিনি যে নিরহংকারী মানুষ এটা আস্তে আস্তে জেনেছে মানুষ।

অন্য রাজনীতিবিদদের মতো তিনি ছিলেন না। তিনি বরাবর গতানুগতিকতার বাইরের একজন মানুষ। মানুষকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি কোনদিন দেননি। মিথ্যে বলতেননা বা কাউকে তোষামোদী করতেন না বলে অনেকে বলতো তিনি রাজনীতি বোঝেন না। রাজনীতির নোংরা কূটকৌশল করতেন না। জনসভায় দাঁড়িয়ে কখনো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেননি। বিরোধী রাজনীতিকে শ্রদ্ধা করতেন। কখনো কারো উপর প্রতিশোধের চিন্তা করতেন না। সত্য কথা বলতে কখনো পিছপা হননি। তিনি নিজদলীয় লোকদের খারাপ কাজেরও সমালোচনা করতে ছাড়তেন না। তিনি সব সময় বলতেন, 'সত্যের জন্য জীবন গেলেও পরোয়া নেই'। তার মধ্যে অদ্ভুত এক সারল্যও আমি দেখতে পেতাম। তিনি যা বলতেন সোজা সাপটা বলে দিতেন। ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা কেমন করে বলতে হয় তা জানতেন না। আসলে তার কোন দুর্বলতা ছিলনা। কারো কাছে তার কোন দায়বদ্ধতাও নেই; সেজন্যই তিনি ছিলেন অকপট। কাউকে মিথ্যে তোষামোদ বা খুশী করার তার কোন দরকার নেই। তার এই আপাত: সরলতাকে কেউ কেউ পূজী করার চেষ্টা করেছে বটে তবে আখেরে কারো কোন ভালো হয়নি।

অনেকেই তাকে ফাঁকি দিয়ে কিছু পাওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু তিন সবই বুঝতেন, বুঝেও কিছু বলতেন না। এইভাবে তিনি রাজনীতির মানুষ চিনেছেন। তিনি বলতেন, 'আমি মানুষকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখলেই বুঝতে পারি কে কেমন'। কথাটা যে সত্য তার অনেক প্রমাণ আমি পেয়েছি। অনেকেই বন্ধুর বেশে এসে কিছু ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করেছে কিন্তু সেটা ছিল খুবই সাময়িক।

তার মধ্যে আল্লাহ কিছু ঐশ্বরিক গুনাবলী দিয়েছিলেন বলে আমার মনে হতো। এটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। যেমন একটা উদাহরন দেই। এটা নিয়ে আমরা নিজেরা অনেকবার কথা বলেছি। কেনো এমন হয় এসব নিয়ে। মুন্নু সাহেবের প্রোগ্রাম কখনো প্রাকৃতিক কারণে বাতিল করতে হয়নি। দেখা গেলো আমরা ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়েছি, পথে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে, ঝড় বন্যা হচ্ছে কিন্তু অনুষ্ঠানে স্থলে পৌঁছে দেখলাম সব ঠিক ঠাক। বৃষ্টি থেমে রোদ উঠে গেছে। এরকম একবার নয় বহুবার হয়েছে। আমি বিস্মিত হয়ে ভেবেছি কেনো এরকম হয়! তার সাথে সরাসরি কোন যোগাযোগ আছে আল্লার! কিছু একটা আছে তার মধ্যে যেটার কারণে তিনি একা একা অনেক দুর্গম পথ পারি দিতে পেরেছেন। হয়ত তার সততার জন্যই এমনটি হয়ে থাকবে।

কেউ শেষ পর্যন্ত তার পথ আটকাতে পারেনি। যেই তার ক্ষতির চেষ্টা করেছে সেই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এরকম হাজারটা ঘটনা আমি ঘটতে দেখেছি। তাকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ ছিলনা। কিন্তু তিনি কখনো এসব নিয়ে উচ্চবাচ্য করতেন না। তিনি বলতেন, ‘মানুষ আমাকে পা ধরে টানে আর আল্লাহ আমাকে চুল ধরে টানে’। তার উত্থান কোন আকস্মিক ঘটনা না। তিনি উঠেছেন ধীরে ধীরে কিন্তু কোন ফাঁক নেই। তার উচ্চতার গ্রাফটা একই গতিতে উঠেছে। কখনো উঠেছে কখনো নেমেছে এরকম হয়নি কখনো। একলক্ষ প্রতিকুলতা পারি দিয়েই তিনি আজ সফল একজনে পরিণত হতে পেরেছেন।

৭.

লেখার শুরুতেই তার সমায়ানুবর্তীতার কথা বলেছিলাম। আমি জীবনে আর একজন দ্বিতীয় মানুষ দেখিনি যে সময়কে এতখানি মূল্য দেয়। আজ উত্তর আমেরিকায় বসে অনুভব করছি সময়ের মূল্য কতখানি। যেটা তিনি অনেক আগেই বুঝেছিলেন। অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছেন। তিনি আর দশজন রাজনীতিকের মতো ছিলেন না। তারা সময়কে তেমন গুরুত্ব দিতেন না। এলাকায় কোন প্রোগ্রাম দশটায় থাকলে মন্ত্রী বা নেতারা যেতেন দু’ তিন ঘন্টা পর। এটাই নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। লোকজন এতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটালেন মুন্নু সাহেবে। তিনি দশটার প্রোগ্রামে দশটা বাজার পাঁচ মিটি পূর্বে যেতে শুরু করলেন। প্রথম প্রথম এমন হয়েছে আমরা অনুষ্ঠানস্থলে গিয়ে দেখি লোকজন স্টেজ বাঁধা ছাদা করছে। আমরা গিয়ে হাজির। উদ্যোক্তাদের দেখা সাক্ষাত নেই। একটা বিব্রতকর অবস্থায় পরে যেতো লোকজন। পরে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়। আমার বারো বছরের অভিজ্ঞতায় খুব কমই দেরী করে কোথাও যেতে দেখেছি। লোকজন এরপর জেনে যায় তার সম্পর্কে। তারাই এরপর পূর্ব থেকেই তৈরী হয়ে থাকতো। কখনো দেরী হওয়াটা ছিল নিতান্তই আকস্মিক। এজন্যে তিনি ক্ষমা চেয়ে নিতে ভুল করতেন না। তিনি সবসময় বলতেন, ‘কারো সময় নষ্ট করার অধিকার আমার নেই। আমার জন্য কারো এক মুহূর্ত নষ্ট হোক তা আমি চাইনা’।

যত দুরের প্রোগ্রাম হোক না কেনো তিনি চেষ্টা করেছেন সময় মতো পৌঁছাতে। এজন্যে তিনি হাতে সময় নিয়ে বের হতেন। এব্যাপারে কোন এক্সকিউজ ছিলনা। কখনো আমার

দেরী হলে মহা টেনশনে পড়ে যেতাম। জানি তিনি বেশীক্ষন অপেক্ষা করবেন না। গিয়ে হয়ত দেখি তিনি গাড়িতে বসে আছেন। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ড্রাইভার রেডি। এমন হয়েছে হাতে সময় কম, খাওয়ার সুযোগ হয়নি। কখনো প্লেটে অর্ধেক খাবার রেখেই আমাদের ছুটতে হয়েছে। তার স্পীডের সাথে পারাই ছিল দুষ্কর। অনেক দিন রাস্তা থেকে আমরা বিস্কুট এবং কলা কিনে খেয়েছি। প্রায়শই আমরা খাবার সাথে করে নিয়ে গিয়েছি। যাতে অন্য কাউকে বিরক্ত করতে না হয়। গাড়িতে বসেই আমরা আমাদের খবার সেরে ফেলতাম। আমাদের মেনু ছিল চিকেন স্যান্ডউইচ এবং ফ্রুটস।

অনেক সময় ইঞ্জিন বোটে করে আমরা বিস্তীর্ণ চরাঞ্চলে গিয়েছি বা হেলিকপ্টারে করে গিয়েছি কোথাও, আমাদের দেরী হয়নি কখনো। খাবার দাবার আমরা ঢাকা থেকেও নিয়ে যেতাম অনেক সময়। অন্তত পঞ্চাশজন খেতে পারে এরকম খাদ্য আমাদের সাথেই থাকতো। এক্ষেত্রে আমাদের মেনু হতো চিকেন খিচুরী। খাবারের কোনদিন সর্ট পড়তে শুনিনি। রোজার মাসে মুখরোচক সব ইফতারি তৈরী হতো। এখনও মনে হলে জিবে পানি আসে।

এমন হয়েছে আমরা স্পীডবোটে করে রিলিফ ওয়ার্ক করছি। চারিদিকে বন্যার অথৈ জলরাশি। দাঁড়ানোর জায়গা নেই। আমরা বোট বসেই ভাসতে ভাসতে খাওয়া সারছি। এমন হয়েছে এক একদিন আমাদের দশ বারোটি যায়গায় যেতে হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেরী হয়নি কখনো। সময়ের মূল্য বোঝেন বলেই আজ তিনি এতবড় হতে পেরেছেন।

৮.

মিডিয়ার সাথে তার অসাধারণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পূর্বে থেকেই তার সাথে মিডিয়ার সম্পর্ক থাকলেও আমার সময়ে এর মাত্রা বেড়েছিল কয়েকগুন। জনসংযোগের চাকুরী বলে আমাকে সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলতে হয়। আমার জন্য কাজটা সহজ ছিল। এজন্য যা কিছু করনীয় সবকিছু করার এক্তিয়ার আমার ছিল। এসব ব্যাপারে তিনি ছিলেন স্মার্ট এবং উদার। তিনি আমাকে কখনো কোন কিছুর জন্য প্রেসার ক্রিয়েট না করলেও আমি নিজে থেকেই একটা তাগিদ অনুভব করতাম। এই ঔচিত্তবোধ তিনিই আমার মধ্যে জাগরুক করে দিয়েছিলেন। তাই সবসময়ই আমি নতুন কিছু করার তাগিদ অনুভব করতাম। মানুষ তাকে জানুক এই ভাবনাটা আমার মধ্যে কাজ করতো। আজও করে। এজন্য করে যে, তার মতো আদর্শ মানুষ বড় প্রয়োজন আমাদের।

সংবাদপত্রে তার সংবাদ ছাপা হতো প্রায় নিয়মিত। তিনি যে কভারেজ পেতেন অনেক মন্ত্রীও তা পেতেন না। এক একদিন এমন হয়েছে দশ বারোটি পত্রিকায় একসাথে তার একই সংবাদ ছাপা হয়েছে। সংবাদপত্র ছাড়াও রেডিও টেলিভিশনেও তার সংবাদ থাকতো। জনসংযোগের চাকুরী করলেও আমি বরাবর সংবাদপত্রের সাথে যুক্ত থেকেছি। লেখালেখি আমার প্যাশন। সাপ্তাহিক বিচিত্রা এবং সাপ্তাহিক ২০০০ আমার কাজের ক্ষেত্র। আমার প্রিয় শ্রদ্ধেয় সম্পাদক শাহদত চৌধুরী আজ আর নেই যার সাথে আমি প্রায় ২৩ বছর কাজ করেছি। মুন্নু সাহেবের সাথে তাদের একটা পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। শাহদত ভাইও আমার

চাকুরীর জন্য তখন সুপারিশ করেছিলেন। সংবাদপত্রের সাথে জড়িত থাকা এবং জনসংযোগের চাকুরী দুটোই আমি একসাথ করতে পেরেছিলাম এজন্যে। ক্রিয়েটিভ কাজকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং উৎসাহ দিতেন।

শুধু সিনিয়র সাংবাদিক বা সম্পাদকই নয় জুনিয়ররা সাংবাদিকরাও তাকে পছন্দ করতো। তার যেকোনো অনুষ্ঠানে ঢাকার সাংবাদিকরা হামেশাই যেতেন যারা সবাই প্রায় আমার বন্ধু ছিল। মানিকগঞ্জ প্রেস ক্লাব থেকে শুরু করে সাংবাদিকরা নানাভাবে উপকৃত হয়েছে। আমি নিজেই এটা করতাম দ্বায়িত্ব নিয়ে।

এছাড়া যে কোনো প্রয়োজনে মিডিয়া জগতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। একবার একজন স্পোর্টস জার্নলিস্ট মারা যাওয়ায় তার এক সন্তানের লেখাপড়ার জন্য এক বছরে ৬০ হজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এরকম ঘটনা অনেক আছে। আমি জাতীয় প্রেসক্লাবের মেম্বারশীপ পেয়েছিলাম ১৯৯৫ সালে তারই কারনে। সাংবাদিদের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। সিনিয়র সাংবাদিক, সম্পাদকরা তাকে খুবই পছন্দ করতেন।

এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করছি। ১৯৯৭ সালের ঘটনা হবে। আওয়ামীলীগ তখন ক্ষমতায়। কিছু চক্রান্তকারী ধামরাইয়ে মুন্নু সিরামিকে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর, লুটপাট ইত্যাদি করলো। মুন্নু সাহেব তখন লন্ডন। এই ঘটনায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হলো দেশে বিদেশে। ওয়ার্ল্ডব্যাংক ক্ষুব্দ প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করলো। তার নির্দেশে সেদিন বিকেলেই আমরা প্রেস কনফারেন্স করলাম প্রেসক্লাবের ভি আই পি লাউঞ্জে। অভাবনীয় ব্যাপার ঘটলো। প্রায় আশিজন সাংবাদিক সেদিনের সেই কনফারেন্সে উপস্থিত হয়েছিল। সেদিন সাংবাদপত্র যেভাবে এই অন্যায়ের বিরোধিতা করেছিল তা বিস্ময়কর। শেয়ার কেলেংকারীর সময়ও আমরা প্রেসক্লাবে একবার প্রেস কনফারেন্স ডাকলাম। তখনও এমনই হয়েছিল। মুন্নু সাহেব তখন শেয়ার হোল্ডাদের উদ্দেশ্যে বেশী দাম দিয়ে শেয়ার না কেনার জন্য বলেছিলেন। এ জাতীয় ঘটনা বিরল।

৯.

আজকে যে বিশাল মুন্নু শিল্প গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে তা একদিনে হয়নি। এই যে এক এক করে গড়ে উঠেছে মুন্নু সিরামিক বা মুন্নু ফেব্রিক্সের মতো বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান তার পিছনে রয়েছে তার দীর্ঘ দিনের শ্রম নিষ্ঠা আর পরিশ্রম। মুন্নু সাহেবকে 'সেলফ্ মেইড ম্যান' বলা হয়ে থাকে। মাত্র ৭৫ টাকা দিয়ে তিনি তার ব্যবসা জীবন শুরু করেন। মুন্নু আর্ট প্রেস তার জীবনের প্রথম নিজস্ব ব্যবসা যেটাকে তিনি আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন। তারপর থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে তিনি ব্যবসার সাথে জড়িয়ে আছেন এবং একটার পর একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। বিদেশে দেশের মুখ উজ্জল করছেন, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে হাজার হাজার মানুষের। তিনি যখন যে ব্যবসায়ই হাত দিয়েছেন সেটাতেই সোনা ফলিয়েছেন। তার দুরদর্শীতার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে।

তার শেয়ার হোল্ডাররা তাকে খুবই ভালোবাসতেন। দীর্ঘ একযুগ আমি তার কোম্পানীর প্রতিটা এনুয়াল জেনারেল মিটিং-এ থেকেছি। মিটিং শেষে দেখতাম সাধারণ শেয়ার হোল্ডাররা তার সাথে ছবি তোলার জন্য হুমরি খেয়ে পরতো। তিনি যে লভ্যাংশ দিতেন তাতে কখনো কোন শেয়ার হোল্ডারকে অসন্তোষ প্রকাশ করেতে দেখিনি। বরং শেয়ার হোল্ডাররা তাকে দোয়া করতো। তার কুশলী এন্টারপ্রেনারশীপের জন্য তারা ভূয়শী প্রশংসা করতো। এটা বাংলাদেশের প্রাইভেট সেক্টরে খুবই বিরল ঘটনা। বাংলাদেশের মন্ত্রীরা বিদেশে দেশের শিল্প বাণিজ্যের কথা উঠলে উদাহরণ হিসেবে মুন্নু'র কথা বলে সবসময়।
তিনি একজন পরিশ্রমী মানুষ। কোন কিছুই তার সহজে অর্জিত হয়নি। একজন একক মানুষ হিসাবে তার অর্জন অসাধারণ। তিনি বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। ছাত্র হিসাবেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জনের পর চাকুরীর দিকে না যেয়ে ব্যবসার প্রতি মনোনিবেশ করেন। শুরুর দিকে তাকে একাই সব কিছু করতে হয়েছে। তার মুখেই শুনেছি তিনি একটানা ষোল বছর প্রতিদিন আঠারো ঘন্টা কাজ করেছেন। আজকে এতটা বয়সেও তিনি প্রতিদিন ষোল ঘন্টা করে কাজ করেন। এখনো তাকে একজন তরুনের সাথে তুলনা করা যায় অনায়াসে। তারুণ্যের যে উদ্যম তা আজও দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে। আজও তিনি তার সকল কর্মকান্ড সুচারুরূপে পরিচালিত করছেন। নিজের অফিস, রাজনীতি সবকিছুই চলছে সুচারু রুপে।
শুধু শিল্প প্রতিষ্ঠানই নয় তিনি গড়ে তুলেছেন একাধিক স্কুল, হাসপাতাল, মসজিদ, আশ্রয়কেন্দ্র। এছাড়াও মানিকগঞ্জের এমন কোন এলাকা নেই যেখানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদ্রাসা, ক্লাবে তার দানের স্পর্শ নেই।
শুধু মানিকগঞ্জই নয় এর বাইরেও চট্টগ্রাম, বরিশাল, টাঙ্গাইলের বিভিন্ন যায়গায় তার দান রয়েছে। আমি নিজেও কয়েকবার আমার এলাকার মসজিদের জন্য তার কাছ থেকে ডোনেশন নিয়েছি। তার সাথে ঘুরেছি বিভিন্ন যায়গায়। হাজার হাজার মাইল পারি দিয়েছি তার সাথে। যেখানে ডাক পরেছে সেখানেই ছুটে গেছেন কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো রিক্সায়, কখনো হোন্ডার পিছনে চড়ে, কখনোবা নৌকায়। সংসদ সদস্য হিসাবে প্রতিবছর তিনি অনুদানের জন্য যা যা পেতেন তার প্রতিটি কনা সাহায্য হিসাবে দিয়ে দিতেন। এলাকার এমন কোন মসজিদ মাদ্রাসা বা ক্লাব নেই যেটা একাধিকবার অনুদান পায়নি। এমন কোন গরীব মানুষ নেই যে খালি হাতে ফিরেছে। বাই রোটেশন করে অনুদান দেয়া হতো। একচোখা কোন নীতি পছন্দ করতেন না। সমবন্টনের নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।
তার মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ব্যাপার আমি দেখেছি, দেখে বিমোহিত হয়েছি, হতবাকও কম হয়নি। আজকের দিনে মানুষ কিভাবে নিজেকে এতটা পারফেক্ট রাখতে পারে তা ভেবে অবাক হয়েছি। তিনি কোরাণ সুন্নাহ্ মাফিক চলার চেষ্টা করতেন। মানুষকে কোন ভাবেই ঠকানোর কথা তিনি ভাবতে পারেতেন না। তার সাথে যারা ব্যবসা করেন তারাও থাকেন সন্তুষ্ট কারণ তাদের পাওনা চেক পেতে কোনদিন দেরী হয়নি। আমার বারো বছরের

অভিজ্ঞতায় দেখেছি কোনদিন আমাদের বেতন পেতে একদিনও দেরী হয়নি। যদি কখনো মাসের ১ তারিখ অফিস বন্ধ থাকতো তাহলে আগের দিন বেতন দিয়ে দেওয়া হতো। এই নিয়ম আজ চল্লিশ বছর ধরে চলছে। কোন দুর্বিপাকেও এর অন্যথা হয়নি।

আমাদের মন্ত্রী, এমপিদের লাখ লাখ টাকা টেলিফোন বিল আজও পাওনা আছে। তারা মনে করে এটা তাদের না দিলেও চলে। জনগনের পয়সায় ফুর্তি করতে তারা আনন্দ পায়। কিন্তু তিনি এসব অনিয়মকে অপছন্দ করতেন। তার সংসদ সদস্য হিসাবে টেলিফোন বিল দিতে কখনো একদিনও দেরী হয়নি। তিনি কোন দিন ডিফলন্টার হননি। আমাদের প্রতি কড়া নির্দেশ ছিল এসব ব্যাপারে সচেতন থাকার।

এজন্যে যে কোন কাজ আমরা সহজে করতে পেরেছি। আমাদের কখনো কোন কিছুর জন্য প্রভাব খাটাতে হয়নি। মানুষ তার নাম শুনেই কাজ করে দিত। আমরা গর্ববোধ করতাম যখন কোন সরকারী অফিসে ঘুষ ছাড়াই আমাদের কাজ হয়ে যেতো। যখন যেখানে গিয়েছি তার প্রতি মানুষের মধ্যে শ্রদ্ধা দেখেছি। আমরাও যথেষ্ট গুরুত্ব পেতাম। এলাকার কাজের জন্য আমাকে নানা যায়গায় যেতে হতো। প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে শুরু করে মন্ত্রী, এমপি, ডিসি, টিএনও সর্বত্রই তার সততার জন্য আমাদের গুরুত্ব দেয়া হতো। আমি খুবই এনজয় করতাম এসব। গভীর জীবনবোধ, মানবিক গুনাবলী, ন্যায়পরনতা এবং সততার জন্যই তিনি এভাবে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিতে পেরেছেন।

১০.

রাজনীতিবিদ হিসাবেও তিনি ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি আর দশজন তথাকথিত রাজনীতিবিদদের মতো ছিলেন না। রাজনৈতিক বেশ্যাপনাকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। এজন্যে তার সাথে অনেক তথাকথিত ডাকসাঁইটে রজানীতিকের বনিবনা হতোনা। আদর্শের লড়াইয়ে অনেকের সাথেই তার ফাইট হতে দেখেছি। একবার একজন ডাকসাইটে রাজনীতিবিদ ও মন্ত্রী তার নির্বাচনের খরচের জন্য তার কাছে পঁচিশ লাখ টাকা চাইলেন। সেই রাজনীতিবিদ একজন ধনী মানুষ। টাকা তিনি তাকে দেননি। তিনি বলতেন ‘আমি টাকা তাকেই দেই যার নেই’। তিনি বলতেন, ‘যার আছে তাকে দেয়াতো অন্যায়’। এই ধরণের আদর্শের লড়াই তাকে প্রতি নিয়ত করতে হয়েছে।

রাজনীতিকে পূঁজি করে ফায়দা লোটার বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি।। তিনি রাজনীতি করেছেন জনগণের জন্য। রাজনীতি তাকে কিছুই দিতে পারেনি বরং তিনি দিয়েছেন অনেক। তিনি একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে যারা কাজ করে তাদের সাথে তিনি কখনো ছিলেন না। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় সরাসরি যুদ্ধে অংশ না নিলেও মুক্তিযোদ্ধাদের নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। এ কথা ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম সহ অনেকেই জানেন। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তার অসীম শ্রদ্ধা দেখেছি। তিনি যখনই সুযোগ পান তাদের জন্য করেন। মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের তিনি মনে প্রানে ঘৃণা করতেন। তিনি তার নীতি থেকে কখনো বিচ্যুত হননি।

বিভন্ন সময় বিভিন্ন দলের রাজনীতিবিদদের তার স্মরানাপন্ন হতে দেখেছি। তিনি চেষ্টা করেছেন তাদের সহযোগিতা করার। বিরোধী রাজনীতির প্রতি তিনি কখনো প্রতিহিংসাপরায়ন ছিলেন না। আমি দেখেছি তার দল যখন ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় তিনি কখনো বিরোধীদের প্রতি কোন শাস্তিমূলক কিছু করেন নি অথচ তারাই যখন ক্ষমতায় ছিল তার দলের প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ন ছিল। তার কর্মীদের তিনি নিরুৎসাহিত করেছেন প্রতিহিংসাপরায়ন হতে। এজন্য বিরোধীরাও তার মহানুভবতায় মুগ্ধ হতো। যদিও বাংলাদেশের রাজনীতি প্রতিহিংসার রাজনীতি। ঘৃণার রাজনীতি। তিনি করেছেন উল্টো। এজন্যেই অনেককে বলতে শুনেছি মুন্নু সাহেব রাজনীতি বোঝেনা। তিনি তখন বলতেন, 'ওই রাজনীতি আমি বুঝতেও চাইনা যে রাজনীতি ঘৃণার আর প্রতিহিংসার। যে রাজনীতি মানুষকে কষ্ট দেয় সে রাজনীতি আমি করতে চাইনা। রাজনীতি আমার ব্যবসা না। এজন্যেই আমি প্রতিষ্ঠিত হয়ে রাজনীতিতে এসেছি। অন্য অনেকের মতো রাজনীতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়নি'।

রাজনীতিকদের হঠকারীতার কথা তিনি সব সময় বলতেন। 'তারা জনসভায় দাঁড়িয়ে যা বলে তা বিশ্বাস করেনা। বলে একটা করে আরেকটা। পার্লামেন্টের মতো প্রবিত্র জায়গায় দাঁড়িয়েও তারা মিথ্যে বলে'। তাকে পার্লামেন্টে সবসময় সত্য কথাটাই বলতে দেখেছি। জনগনের কথা বলছেন। এলাকার উন্নয়নের কথা বলছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'দেখবে কোন রাজনীতিবিদের ছেলেমেয়েরাই দেশে পড়াশুনা করেনা। সাধারণ মানুষেরা সন্তানেরা আন্দোলন করে গুলি খায় আর তারা তার ফল ভোগ করে। আমরা তাদের ব্যবহার করে ক্ষমতায় গিয়ে ছুড়ে ফেলে দেই'। তিনি সবরকম অসততার বিরুদ্ধে ছিলেন। এই নিয়ে তার মধ্যে অনেক যন্ত্রনা ছিল। তিনি বলতেন 'আমার জীবন দিয়ে হলেও যদি দেশটাকে ভালো করা যেতো তাহলে তাই করতাম। কিন্তু সেটা তো হচ্ছেনা'।

তাকে রাজনীতিতে প্রথম থেকেই নিজদলীয় কতিপয় রাজনীতিকদের বিরোধীতা মোকাবেলা করে চলতে হয়েছে। তিনি রাজনীতিতে আসেন এটা কেউ কেউ চায়নি। কারণ তার মতো সৎ লোক রাজনীতিতে এলে কারো কারো জন্য অসুবিধা হয়ে যায়। তারা তার বিরোধিতা করতে থাকে। এ নিয়ে তাকে অনেকবার বিরোধে জড়ানো হয়েছে। তিনি সাহসিকতার সাথে সব ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করেছেন। এসবের সুযোগও নিয়েছে অনেকে। বিরোধিতায় ইন্ধন যুগিয়ে অনেকেই ফায়দা লুটতে চেয়েছে। সেটা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত।

রাজনীতির কূট কৌশল তিনি প্রথম প্রথম ভালো বুঝতেন না। এটার সুযোগ নিয়েছে অনেকে। তিনি সবসময় সহাবস্থান চাইতেন। কোন ঝগড়াঝাটি না করে সম্মিলিতভাবে এলাকার উন্নয়ন চাইতেন। কিন্তু সেটা বার বার বাধাগ্রস্থ হয়েছে। অনেক সমস্যা মোকাবিলা করে তাকে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা পেতে হয়েছে। এক্ষেত্রে মানুষের স্বার্থপরতা দেখে তিনি হতবাক হতেন। শুধু জনগনের ভালোবাসাই ছিল তার সম্বল। যে কোন দুর্যোগে জনগণই তার পাশে থেকেছে।

রাজনীতির পুরষ্কার তিনি পেয়েছেন। তবে তার যোগ্যতা ছিল অন্য অনেকের চেয়ে বেশী। আমাদের দেশে ভালো লোকের মূল্যায়ন হয় কম। সততার তেমন কোন দাম নেই। তারপরও তিনি প্রতিবার এমপি হয়েছেন, দলের জেলা সভাপতি হয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হয়েছেন, মন্ত্রী হয়েছেন। ২০০১ এ তিনি মানিকগঞ্জের দুটো আসন থেকে নির্বাচিত হন। এরপর মন্ত্রী হন। আমার মনে আছে যেদিন মন্ত্রীসভার শপথ হয় সেদিন তার সাথে আমি বঙ্গভবন গিয়েছিলাম। সেটাও একটা স্মরনীয় মুহুর্ত বৈকি। মন্ত্রী হওয়ার পর দেখেছি তার বিনয়। তিনি সর্বান্তকরনে চেষ্টা করেছেন কিছু করার। এক্ষেত্রেও তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। তাকে কাজ করতে বাধা দিয়েছে স্বার্থান্বেষীরা। কিন্তু তিনি কখনো তার আদর্শ বিসর্জন দেননি। কারো কাছে মাথাও নত করেননি। এটাই তার বৈশিষ্ট। এটাই তাকে ভিন্ন মানুষে পরিণত করেছে।

১১.

তিনি একজন মিষ্টভাষী মানুষ। কথা বলেন যুক্তি দিয়ে। যুক্তিতে তাকে কেউ হারাতে পারতো না। মিথ্যেকে তিনি অপছন্দ করেন। তিনি যখন অলোচনার টেবিলে বসেন বা জনসভায় বক্তৃতা করেন তখন মানুষ তার কথা শুনতো মন্ত্রমুগ্ধের মতো। বড় বড় আমলাদের তার জীবনদর্শন বা তার সততায় মুগ্ধ হয়ে যেতে দেখেছি। জনসভায় তিনি কোনদিন লিখিত বক্তৃতা বলতেন না । যেকোন পরিস্থিতি মোকাবেলার এক অসাধারণ ক্ষমতা তার ছিল। তিনি কখনো হারতে শেখেন নি। পরাজয় কাকে বলে তার অভিধানে নেই। এজন্যই তিনি যেকোন কাজে সফল হয়েছেন।

বিদেশীরাও তাকে খুব সম্মানের চেখে দেখতো। বিদেশী ডেলিগেট বা বাংলাদেশে বিদেশী এম্বাসাডররা যখন তার আতিথ্য গ্রহণ করতেন বা তার ফ্যাক্টরী ভিজিটে আসতেন তখন দেখতাম তাদের চোখে মুখে মুগ্ধতার ছাপ। বাংলাদেশে যে এত সুন্দর করে ফ্যাক্টরী পরিচালনা করা সম্ভব এটা দেখে তারা মুগ্ধ হতেন। একবার আমেরিকা, সুইডেন, স্পেন সহ বেশ কয়েকটি দেশের এম্বাসাডররা এলেন মুন্নু সিরামিকের ফ্যাক্টরী ভিজিটে। আমিও সেদিন উপস্থিত ছিলাম। ভিজিট শেষে এক ব্রিফিং-এ তারা মুন্নু সিরামিক ফ্যাক্টরীর পরিবেশকে একটি ফুলের বাগানের সাথে তুলনা করলেন।

তিনি একজন প্রকৃতি প্রেমিকও বটে। তার নিজস্ব বাসভবন, ফ্যাক্টরী প্রাঙ্গন সর্বত্রই এমন একটা পরিবেশ তৈরী করেছেন যে, যে যখনই এসেছে মুগ্ধ হয়েছে। চারিদিকে গাছ গাছালি আর বাহারি ফুলের সমাবেশ ঘটাতেন সর্বত্র। অনেকের মুখেই এসবের প্রশংসা শোনা যেতো। একজন সম্পূর্ণ মানুষের সবগুলি গুনাবলীই তার মধ্যে আমি খুঁজে পাই। রুচিশীল আর পরিমিতবোধের মানুষ পৃথিবীতে জন্মায় অল্প। যে অল্প কয়েকজন মানুষ আছেন তিনিও তাদের একজন। তার সব কিছুতেই রয়েছে সৌন্দর্য্যের এক অপরূপ সমন্বয়। তার পোশাক পরিচ্ছদ, চলা ফেরা সবকিছুতে রুচির ছাপ রয়েছে। টাকা হলেই সবাই রুচিশীল হতে পারেনা, হতে পরেনা আধুনিক মানুষ। তিনি আপদমস্তক একজন আধুনিক মনের মানুষ।

কোন ধরণের কুসংস্কার বা ধর্মান্ধতা নেই তার মধ্যে। ধর্মভীরু মানুষ হয়েও তার মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া সর্বত্র।

তিনি সংস্কৃতি মনস্ক মানুষ। পড়াশুনার প্রতি প্রবল ঝোঁক। এজন্য তার স্টাডি রুমে গড়ে তুলেছিলেন বইয়ের লাইব্রেরী। সেখানে নানা ধরনের বইয়ের সংগ্রহ ছিল। যেকোন কালচারাল অনুষ্ঠানে আগ্রহ নিয়ে যেতেন। যারা ভালো পারফর্ম করতো তাদের উৎসাহ দিতেন এবং পুরস্কৃত করতেন। সংগীতের প্রতিও ঝোঁক ছিল। ব্যস্ততার মধ্যেও যখন গাড়িতে যেতেন পুরনো দিনের গান শুনেন। ভালো ভালো বিশেষ করে পলিটিকাল ছবি দেখেন।

তার জীবন যাপন খুবই ডিসিপ্লিনড। সাধারণত: তিনি আর্লি ঘুমান এবং আর্লি জাগেন। এই নিয়মের ব্যতিক্রম বেশী ঘটতে দেখিনি। সময়মত খাওয়া দাওয়াও তার নিয়মের একটি। খাওয়া দাওয়ায় তিনি অত্যন্ত পরিমিত। স্বল্পাহারী। বাঙ্গালী খাবারই তার পছন্দের। তার ফ্যাক্টরী প্রাঙ্গনে সব ধরণের সব্জী এবং পুকুরে মাছের চাষ হয়। ঝাল জাতীয় খাবার তার পছন্দের। দেশীয় পিঠা পায়েস এগুলো তিনি পছন্দ করেন। একজন প্রকৃত বাঙ্গালীর সবগুলো গুনাবলীই তার মধ্যে দেখতে পেতাম আমি। ঘরে তিনি সবসময় সাদা পাজমা-পাঞ্জাবী পরিধান করতেন। অফিসে স্যুট।

আমি নিজেও তার কাছ থেকে অনেক ভালো ভালো উপহার পেয়েছি। মনে আছে একদিন হঠাৎ লন্ডন থেকে তার ফোন। তিনি জানতে চাইলেন আমার জন্য কি আনবেন। আমি খুবই বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন। এরকম ঘটনা অনেক আছে। শুধু আমিই নই তিনি যাদেরকে পছন্দ করতেন তাদের এসব জন্যই করতেন। তিনি সবসময় বলতেন 'দেয়ার মধ্যে যে আনন্দ তার কোন তুলনা হয়না'। তিনি যা কিছু করতেন নি:স্বার্থভাবেই করতেন। তিনি কোনদিন বিনিময় প্রত্যাশী ছিলেন না। তিনি ঋণী হতে পছন্দ করতেন না।

১২.

আমার কাছে শিল্পপতি মুন্নুর চেয়ে মানুষ মুন্নু অনেক বড় ছিল। আমার এই লেখার মাধ্যমেও মানুষ মুন্নুকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সবটুকু হয়ত পারিনি। ব্যক্তিগতভাবে আমি তেমন উচ্চাভিলাষী নই। টাকা পয়সার প্রতি আমার কোন লোভ নেই। সুন্দরভাবে বেঁচে থাকাটাই আমার কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আমি তাকে শ্রদ্ধা করতাম যতটা না 'বস' হিসাবে তার চেয়েও বেশী মানুষ হিসাবে। এজন্য আমাদের মধ্যে চমৎকার একটা বোঝাপড়ার সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। তিনি কি চান সেটা যেমন আমি বুঝতে চেষ্টা করতাম তেমনি তিনিও আমাকে কাজ করার সুযোগ দিতেন। কাজ করার স্বধীনতা আমার ছিল। আমাকে তিনি বুঝতে পারতেন বলে আমার বিশ্বাস ছিল।

আজকে এতদিন পর এই লেখা লিখছি একটা তাগিদ থেকে। মনের তাগিদ। না হলে কত জন আসে কত জন চলে যায়, এটাই পৃথিবীর নিয়ম, এটাই বাস্তবতা। আমি নিজেও প্রবাসী। আমারও ব্যস্ত জীবন। আমি আমার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় তার সাথে পার করেছি, ক্যারিয়ার গড়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল সময়টা। আমার সময়কালটাকে

'আনন্দ-বেদনার কাব্যে'র সাথে তুলনা করা যায়। তার সাথে আমার সান্নিধ্যের সময়টাকে আমি আনন্দের সময় হিসাবে দেখি। বাকী সময়টাকে আনন্দ ও বেদনার মিশ্রণ।

আগেই বলেছি মানুষকে খুশী করা পৃথিবীর কঠিন কাজের একটি। সেই কাজটিই আমাকে করতে হতো সবসময়। মুন্নু সাহেবের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে যেয়ে কখনো কখনো আমাকে রুঢ় হতে হয়েছে, যেটা ছিল আমার স্বভাবের বিরুদ্ধ। তাই সব মানুষকে আমি খুশী করতে পারিনি। আমি দেখেছি মানুষের চাওয়ার কোন শেষ নেই। তিনি যেমন দিতেন অকাতরে তেমনি মানুষের চাহিদাও বেড়ে গিয়েছিল কয়েকগুন।

আমার সম্পর্কে তার কাছে মাঝে মাঝে অভিযোগ যেতো। মুন্নু সাহেব এই নিয়ে আমাকে তেমন কিছু বলেন নি। কারন তিনি মনুষ্য চরিত্র ভালোই জানতেন। তিনি বলতেন 'আমি যে এত করছি আমাকেও কতজন কত কি বলে'! তখন আমি মনে জোর পেতাম। আমার পরিস্থিতি তিনি বুঝতে পারতেন। আমি অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করতাম এটাই সম্ভবত আমার ক্রটি হিসাবে দেখা হতো। এসব কারণে আমার মানসিক শান্তির বিপর্যয় ঘটেছিল। আমি সহজে অন্যায়ের সাথে আপস করতে চাইতাম না।

এই অঞ্চলের মানুষের প্রতি আমার একটা মমতা জন্মে গিয়েছিল। মানিকগঞ্জের প্রতিটা ধুলিকনার সাথে আমি মিশে গিয়েছিলাম। সাধারণ মানুষেরা আমাকে ভালোবাসতো। আমি যখন চাকুরি ছেড়ে দেই তাদের অনেকের চোখে আমি পানি দেখেছি।

যাইহোক মানুষতো আর ফেরেশতা না।

দোষে গুনে মানুষ। দিন ছাড়া যেমন রাত্রি ভালো লাগেনা বা অন্ধকার ছাড়া আলো তেমনি মানুষও ক্রুটিমুক্ত নয়। মুন্নু সাহেবের মানবিক গুনাবলী ছিল এতবেশী যে ছোট খাট ক্রটি চোখ এড়িয়ে যেতো; যেটা কারো জন্য ক্ষতির কারণ হয়নি। তিনি একটু জেদী ছিলেন বটে কিন্তু সেটা আদর্শগত কারণে। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে যেয়ে সহজে আপসের রাস্তায় হাঁটেননি। পূর্বাপর ফলাফলের তোয়াক্কা করেননি। তার নিজস্ব বিশ্বাস থেকে তাকে সহজে ফেরানো যায়নি। তাকে দিয়ে কোন অন্যায় কাজ করানো যায়নি। আমার সম্পর্কে কত কথা শুনতে হয়েছে তাকে, তারপরও তিনি কোনদিন তেমন আমলে নেননি। আমি চাকুরী ছেড়ে দেই এটাও চাননি। বরং বলেছিলেন, 'আমি যতদিন আছি তুমিও থাকবে'। তিন এরকমই মানুষ।

তিনি যখন একা থাকতেন তখন মন খুলে অনেক কথা বলতেন। মাঝে মাঝে শিশুর মতো হয়ে যেতেন। মনে হতো তাকে বোধহয় চিনি না। আবেগপ্রবন এক মানুষ। এই রূপ দেখার ভাগ্য সবার হয়না। সবসময় গাম্ভীর্যের খোলসে নিজেকে বন্দী রাখা যায় না। একদিন তিনি আমাকে বললেন, 'আচ্ছা জসিম, আমি এত টাকা দিয়ে কি করবো! একজন মানুষের আর কত লাগে'! এই ধরনের কথা কেউ বলতে পারে আমি কল্পনাও করতে পারিনা। আমি উত্তরে বল্লাম, আপনিতো মানুষের জন্য অনেক করছেন, আরো করেন।

সেটা ছিল ১৯৯৬ সাল। অসহযোগ আন্দোলন চলছে। আমি প্রতিদিন মহাখালী থেকে ধানমন্ডি আসি পায়ে হেঁটে। কোন কাজকর্ম নেই। সব স্থবির। দু'জনে বসে বসে যত

রাজ্যের কথা বলি। দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হয়। দেশ নিয়ে তিনি সারাক্ষন অস্থির থাকতেন। প্রায় একমাস একরকম অস্থিরতা ছিল দেশ জুড়ে। এই সময়টায় তাকে অনেক কাছ থেকে দেখেছি। মাঝে মাঝে যখন হরতাল হতো বা শ্যামলী অফিসে তিনি প্রায়ই আগে ভাগে চলে আসতেন, আমরা দু'জন বসে কথা বলতাম বা কথা ছাড়াই নীরবে সময় পার হতো।

একজন মানুষ কখনো কখনো মন্ত্রী, এমপি বা শিল্পপতি ছাড়াও সে একজন শুধুই মানুষ। সেই মানুষটিকে আমি দেখেছিলাম। তিনি চির জাগরুক থাকুন মানুষের অন্তরে, যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন এবং মৃত্যুর পরও যুগে যুগে।

জসিম মল্লিক
Toronto
jasim_mallik@hotmail.com